[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কারণ রোজায় শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের ফলে এসব ওষুধের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। দৈনিক একবার খেতে হয় এমন ওষুধ রমজান মাসে সেবনে তেমন পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও দুই বা ততোধিক বার সেবনকারী ওষুধের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনার দরকার হয়।

ভোকাল কর্ডের সমস্যায় কী করবেন?

একে অপরের সঙ্গে কথা বলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ভোকাল কর্ড। বিভিন্ন কারণে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সঠিক চিকিৎসা নিয়ে পুরোপুরি সুস্থতা লাভ করা যায়। কণ্ঠনালির নানা সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেড-নেক সার্জন ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী।

আমাদের গলার সামনে ল্যারিংস বা শব্দযন্ত্র অবস্থিত। ল্যারিংস বা শব্দযন্ত্রে দুটি ভোকাল কর্ড থাকে। এই কর্ড দুটির কম্পনের মাধ্যমে শব্দ তৈরি হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস থেকে প্রবাহিত বাতাস ভোকাল কর্ডে কম্পনের সৃষ্টি করে।

কথা বলা বা গান গাওয়ার সময় এই পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ থেকে ১০০০ বার। একজন বয়স্ক মানুষের দিনে এক মিলিয়ন বার ভোকাল কর্ড দুটির সংস্পর্শ হয়। অতএব চিন্তা করুন ভোকাল কর্ডের ওপর আমরা কতটুকু নির্ভরশীল-কাজে, গৃহে ও সবসময় সবখানে। তাই কণ্ঠকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখা দরকার।

পারস্পরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো কণ্ঠ বা কথা বলা। অথচ আমরা কণ্ঠস্বর সম্পর্কে তেমন সচেতন নই।

একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হবে তার অনেকটাই নির্ভর করে তার কণ্ঠের ওপর। তাই নিজের সুস্থ থাকার পাশাপাশি শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো প্রতিদিন কণ্ঠস্বরেরও যত্ন প্রয়োজন। এজন্য

দরকার কণ্ঠের পরিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত সদ্ব্যবহার। কণ্ঠের অপব্যবহার থেকে সচেতন হয়ে কণ্ঠস্বরের যত্নে যা করা উচিত-

* অযথা চিৎকার-চেঁচামেচি থেকে বিরত থাকতে হবে। উচ্চস্বরে বা অনেক জোরে কথা বললে ভোকাল কর্ডে মাইক্রোহেমোরেজ নামক সমস্যা হয়। এতে হেমাটোমা, ফ্রাইব্রোসিস হয়ে অনেক সময় কণ্ঠ পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকবৃন্দ জোরে চিৎকার করে কথা বলে মনের অজান্তে ক্ষতি করে থাকেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনসভায়, মায়েরা বাচ্চাদের সঙ্গে, ফেরিওয়ালা, হকারসহ বিভিন্ন কণ্ঠ নিভর্রশীল পেশাজীবীরা। কণ্ঠের যত্নে জনবহুল জায়গায় শোরগোলের স্থানে মাইক বা সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা উচিত।

* ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। ধূমপান সরাসরি আক্রমণ করে গলার যে কোনো সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং জটিল করে তোলে। শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ কণ্ঠনালির ক্যানসার রোগী ধূমপায়ী।

* অত্যধিক ঠান্ডা পানি পরিহার করুন। অনেক সময় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বাইরে থেকে এসেই হুট করেই আমরা ফ্রিজের ঠান্ডা পানি পান করি, যা আমাদের গলার জন্য ক্ষতিকর। যাদের ঠান্ডা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা আছে তাদের বিশেষ সতর্কতা মেনে চলা উচিত। এ ছাড়াও ঘাম অনেকক্ষণ ধরে শরীরে থাকলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, এর ফলেও গলা ভেঙে যায়।

ঠান্ডা লেগে যদি গলা বসে যায়, তবে কথা বলা বন্ধ করতে হবে বা কমিয়ে দিতে হবে। কণ্ঠনালিকে বিশ্রাম দিতে হবে, এমনকি ফিসফিস করেও কথা বলা যাবে না। গলা ভাঙা উপশমে ভালো পদ্ধতি হলো গরম বাষ্প টানা (Steam inhalation)। ফুটন্ত পানির বাষ্প যদি দৈনিক অন্তত ১০ মিনিট মুখ ও গলা দিয়ে টানা হয়, তবে উপকার হবে। মেনথল ইনহেলেশনও ভোকাল কর্ডকে কিছুটা আদ্রতা দিয়ে থাকে।

* পানি পানে অনীহা নয়। পানিশূন্যতা (Dehydration) গলাভাঙার আরেকটি রিস্ক ফ্যাক্টর। অনেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করেন না। সারা দিন কথা বলছেন কিন্তু হয়তো পানি পান করছেন না-এসব কারণে কণ্ঠের ক্ষতি হয়। কণ্ঠের সুস্থতার জন্য প্রতিদিন অন্তত দুই লিটার পানি পান করতে হবে। কফি, চা, কোমল পানীয় শরীরের কোষে পানিশূন্যতা ঘটায়; তাই খেলে অল্প পরিমাণে খেতে হবে।

* খাদ্যাভাসে এবং দৈনন্দিন জীবন-যাপনে দিতে হবে বিশেষ নজর। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে একটি অভ্যাস হলো, আমরা অনেক দেরি

করে রাতে খাই এবং খেয়েই শুয়ে পড়ি। এটিও কিন্তু কণ্ঠনালির জন্য ভালো নয়। হাইপার অ্যাসিডিটি আছে, এমন (ল্যারিঙ্গো ফ্যারিঞ্জাল রিফ্লাক্স ডিসিজ) রোগীদের গলার আশপাশে প্রদাহজনিত কারণে অনেক বেশি শুকনো হয়ে যায়। তাদের ক্ষেত্রে রাতের খাবার পর অন্তত দু’ঘণ্টা পরে শুতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। ঘুমনোর সময় মাথা যেন শরীরের তুলনায় একটু উপরের দিকে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এসিডিটির জন্যও গলা ভেঙ্গে যেতে পারে, তাই রোগীর কাছ থেকে রোগের ইতিহাস বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

* কণ্ঠনালিরও বিশ্রাম দরকার। আমরা অনেক সময় বিরতি ছাড়া কথা বলে যাই; আমরা চিন্তা করি না স্বরযন্ত্রও একটি যন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনেক সময় একই রকমভাবে টানা কথা বলতে দেখা যায়। কণ্ঠেরও রেওয়াজ বা ব্যায়াম দরকার। এ ছাড়া শারীরিক ক্লান্তিও কণ্ঠস্বরের ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

* তিন সপ্তাহের অধিক গলা ভাঙা থাকলে অবশ্যই নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। নাক-কান-গলা রোগের চিকিৎসকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভোকাল কর্ড বা কণ্ঠনালি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-ইনডাইরেক্ট ল্যারিংগোস্কোপি/ ভিডিও ল্যারিংগোস্কোপি। কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে ব্যক্তির রোগের ইতিহাস, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাথমিক পর্যায়ে গলা ভাঙার কারণ নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রোজায় ডায়াবেটিক রোগীদের সুগার কেন বাড়ে?

রমজান মাসে ডায়াবেটিক রোগীদের শরীরের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। ১২-১৪ ঘণ্টা অভুক্ত থাকার কারণে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। সুগার বেড়ে যেতে পারে।

রোজায় সুগার বেড়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন পথ্য ও পুষ্টিবিদ জাহিদা সুলতানা।

* খেজুর বেশি খেলে সুগার বাড়ে।

* অনেকেই ওরস্যালাইন/ টেস্টি স্যালাইন খান, ভাবেন এটা তো নোনতা, কিন্তু এতে গ্লুকোজ আছে।

* ইফতারের সময় সামান্য চিনি দিয়ে শরবত খান। ভাববেন না যেন সারাদিন না খেয়ে ছিলাম তাই সামান্য চিনিতে কোনো ক্ষতি হবে না।

* অল্প অল্প করে ২-৩ রকম মিষ্টি ফল খান। তরমুজ, আপেল, পেয়ারা, আনারস, লিচু, আম যা ব্লাড সুগার বৃদ্ধিতে সহায়ক।

* একসঙ্গে ইফতারে বেশি পরিমাণে খাবার গ্রহণ করলে গ্লুকোজ লেভেল বাড়ে।

* রাতের খাবার বাদ দিয়ে ইফতারে বেশি খেলে এর প্রভাব পরবর্তী দিনের রোজায় পড়ে।

* অনেকেই সেহরির সময় দুধ, ভাত ও কলা মিশিয়ে খান, এটা ব্লাড সুগার বাড়তে সাহায্য করে।

যেসব ভুল এড়িয়ে যেভাবে রোজা সুস্থতার সঙ্গে পালন করা যায়-

* ইসবগুল/তোকমার শরবত কৃত্রিম চিনি দিয়ে তৈরি করে খেতে পারেন। চিনি ছাড়া টক ফলের জুস বাসায় তৈরি করতে পারেন। মিষ্টি ফলের জুস যাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে (খাবার পর ব্লাড সুগার ৮ মিলিমোল/লিটার) তারা খেতে পারেন।

* নবিজির সুন্নত পালনের জন্য একটি খেজুর খান, এর বেশি নয়।

* টক মিষ্টি ফল মিশ্রিত করে খাবেন। যাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা অবশ্যই ব্লাড সুগার বৃদ্ধি করে এমন ফল খাওয়া বন্ধ রাখুন।

* ইফতারে অল্প খান, রাতের সমপরিমাণ খাবার খাবেন ইফতারে। রাতের খাবার হবে সকালের নাশতার সমপরিমাণ।

* সেহরির সময় দুপুরের খাবারের সমান খাবার খাবেন এবং শেষ সময়ে খাবেন তার মানে আপনার সেহরি খাওয়া শেষ হবার ৫ মি. পরই যেন ফজরের আজান দেয়।

* সেহরির সময় দুধ ও ভাত/দুধ কলা মিশিয়ে খান। দুধ ও কলা/আম ও ভাত

অ্যালার্জি থেকে জিহ্বা ফোলা ও জ্বালাপোড়া, কী করবেন

অ্যালার্জির কারণে নানা উপসর্গ দেখা দেয় শরীরে। খাবার থেকে অনেক সময় অ্যালার্জি হয়ে থাকে। এই রোগের মূল উপসর্গ চুলকানি ছাড়াও চোখের প্রদাহ এবং জ্বালাপোড়া। অনেক সময় জিহ্বাও ফুলে উঠে। অ্যালার্জি থেকে জিহ্বা ফোলা ও জ্বালাপোড়া হলে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ডা. মো. ফারুক হোসেন।

অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশনের কারণে কিছু খাবার গ্রহণের পর মুখ, জিহ্বা এবং মাড়ি চুলকাতে থাকে। যদি চুলকানির পরিমাণ অল্প হয় এবং শুধু মুখে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটিকে আমরা ওরাল অ্যালার্জি সিনড্রোম হিসেবে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করি।

রোগীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার কারণে হঠাৎ করে জিহ্বা ফুলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে অ্যালার্জিজনিত কারণ হলে দেরি না করে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। ফোলাযুক্ত জিহ্বা ডাউন সিনড্রোম, সংক্রমণ, জেনেটিক, অচলাবস্থা, জিহ্বার ক্যান্সার, এনিমিয়া এবং লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। জিহ্বার টেস্ট বাডগুলোর প্রদাহের অন্যতম কারণ অসাবধানতাবশত জিহ্বার ওপর কামড়। যেসব খাবার এসিডিক, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত অথবা লবণাক্ত সেসব খাবারও জিহ্বায় টেস্ট বাডগুলোর প্রদাহ সৃষ্টি করে ফোলাভাব এনে দিতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে জিহ্বায় ফোলাভাব থাকলে তা এক্রোমেগালি, সারকোমা, ওরাল ক্যান্সার অথবা ডাউন সিনড্রোমের কারণে হতে পারে।

যখন জিহ্বা ফুলে যায় তখন জিহ্বার প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে জিহ্বার স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এর কারণে জিহ্বা খুব মসৃণ দেখা যেতে পারে। যখন আমাদের শরীর যথাযথ কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি১২ শোষণ করতে পারে না তখন পারনিসাজ রক্তস্বল্পতা দেখা দিয়ে থাকে।

এ ধরনের রক্তস্বল্পতায় জিহ্বার প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া অনুভূত হতে পারে। যদি কারো টুথপেস্টের প্রতি অ্যালার্জি থাকে তাহলে জিহ্বার প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া হতে পারে। টুথপেস্ট ছাড়া মাউথওয়াশ, কৃত্রিম দাঁত ও কিছু ওষুধের কারণে অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশনে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দাঁতের চিকিৎসায় পারদ ব্যবহারে যে ক্ষতি

দাঁতের চিকিৎসায় স্থায়ী ফিলিং দেওয়ার সময় অর্থাৎ সিলভার এমালগাম ফিলিং দেওয়ার সময় মারকারী বা পারদ ব্যবহার করা হয়। ডেন্টাল এমালগাম ফিলিংয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ মারকারী বা পারদ বিদ্যমান থাকে। এই পারদ থেকে মুখে আলসার হতে পারে। আরও বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. ফারুক হোসেন।

পারদ সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং চর্ম ও শ্বাসনালি দ্বারা শোষিত হয়। পারদ প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করে। ডেন্টাল এমালগাম ফিলিং দেওয়ার সময় কোনোভাবে পারদ মুখের মিউকাস মেমব্রেনের সংস্পর্শে এলে এবং মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করলে মুখে আলসার বা অন্য যে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পারদের বাষ্প কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক যা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। মারকারী বা পারদের প্রভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ডিজেনারেশন হয়ে থাকে। সিলভার এমালগাম ফিলিং আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এটি বিজ্ঞানসম্মত সত্য যে, বিষাক্ত পারদের বাষ্প সিলভার এমালগাম ফিলিং থেকে নিঃসৃত হয়। এমালগাম ফিলিং যে দাঁতে থাকে তার পাশে মিউকোসায় রেটিকুলেট, লেসি, প্ল্যাকের মতো বা ইরোসিভ লাইকেনয়েড রিঅ্যাকশন দেখতে পাওয়া যায়। তবে সবসময় বা সবার ক্ষেত্রে এ ধরনের লক্ষণ দেখা যায় না।

দাঁতে সিলভার এমালগাম ফিলিং দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত ফিলিংয়ের উপাদান মুখে থেকে গেলে তা মুখের মিউকোসাতে পিগমেন্টেড প্লাগ তৈরি করতে পারে যা এমালগাম টাট্টু নামে পরিচিত। অনেক সময় মুখের মিউকোসাতে মারকারী বা পারদ শোষিত হলে মুখের মিউকোসাতে আলসার দেখা যায়, যা ভালো হতে সময় লাগে।

পাইলস কখন হয়, প্রতিরোধের উপায়

পাইলসের কোনো সঠিক সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত চিকিৎসকদের জানা নেই। কারণ এ রোগটির আসল প্রকৃতি এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বোধগম্য নয়। পাইলস বলতে আমরা বুঝি মলদ্বারের ভেতরে ফুলে ওঠা রক্তের শিরার একটি মাংসপিণ্ড। এরূপ রক্তের শিরার মাংসপিণ্ড বা ‘কুশন’ সব মানুষেরই রয়েছে। তাই প্রকৃত অর্থে পাইলস বা ‘হেমোরয়েড’ আমরা তখনই বলি যখন এটি কোনোরূপ উপসর্গ সৃষ্টি করছে। যেমন মলদ্বারের বাইরে ঝুলে পড়া মাংসপিণ্ড অথবা রক্ত যাওয়া। প্রতিটি মানুষের তিনটি পাইলস বা ‘কুশন’ আছে। বড় পাইলসের মাঝখানে ছোট ছোট পাইলসও থাকতে পারে। মলত্যাগ করার সময় শিরাগুলো কিছুটা ঝুলে পড়ে এবং রক্ত ভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে তারপর ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইডেন মাল্টি-কেয়ার হাসপাতালের (প্রা.) ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড লেজার সার্জন ডা. আসিফ আলমাস হক।

পাইলস কখন হয়: ৩০ থেকে ৬০ বৎসর বয়সের ভেতর এ রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ২০ বছর বয়সের নিচে পাইলস খুব একটা দেখা যায় না। এ রোগ মহিলাদের চেয়ে পুরুষের কিছুটা বেশি হয়।

কারণ: কয়েক শতাব্দীর গবেষণা সত্ত্বেও পাইলসের প্রকৃত কারণ উদঘাটিত হয়নি। তবে কিছু কিছু রোগ পাইলস হওয়াকে ত্বরান্বিত করে, যেমন- মলত্যাগে অতিরিক্ত কোঁত দেওয়া, অনিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ইত্যাদি। অন্য কিছু কিছু কারণ আছে যার জন্য পাইলস হতে পারে, যেমন- বংশগত, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা,

অনেকক্ষণ গরমে থাকা, ভারী ওজন তোলা, গর্ভাবস্থা, আঁটসাঁট পোশাক পরা, হরমোনের প্রভাব, আঁশজাতীয় খাবারের অভাব ইত্যাদি।

উপসর্গ : বহিঃস্থিত পাইলসের ক্ষেত্রে মলদ্বারের বাইরে ফোলা থাকে এবং কিছুটা ব্যথা বা অস্বস্তি হতে পারে। অভ্যন্তরীণ পাইলসের ক্ষেত্রে টয়লেটে টাটকা লাল রক্ত দেখা যায়। কোনোরূপ ব্যথা থাকে না। মলত্যাগের শেষে রক্ত যায়। রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় যায় আবার কখনো তীরের বেগে যায়। রক্ত যাওয়ার পর যদি বেশি ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয় তাহলে এনাল ফিশার বা ক্যানসার হতে পারে। রক্ত যেতে যেতে রোগী গভীর রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারেন। মলদ্বারের বাইরে পাইলসটি ঝুলে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে মলত্যাগ শেষে পাইলসটি আপনা আপনি ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। থ্রম্বোসিস হলে বা পাইলস বাইরে অতিরিক্ত ঝুলে থাকলে ব্যথা হতে পারে। মলদ্বারে শুধু পাইলস রোগই হয় না আরও অনেক রোগ হয় যার শতকরা বিশ ভাগ রোগী পাইলসে আক্রান্ত।

প্রতিরোধের উপায়: এ রোগ প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে সময়মতো কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা, টয়লেটে বসে বসে পেপার/বই না পড়া, খাবারের সঙ্গে আঁশ জাতীয় জিনিস যেমন-ফল, সবজি, সালাদ পরিমাণ মতো খাওয়া, দৈনিক ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা, ভারী ওজন না তোলা, অতিরিক্ত গরমে বেশিক্ষণ না থাকা ইত্যাদি।

প্রথম সন্তানের হৃদরোগ হলে কি দ্বিতীয়টিরও হয়?

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু ছোটবেলা থেকেই নানান স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। তাদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অনেকেরই জানা নেই জন্মগত হৃদরোগ হলেও অনেক শিশু জন্মের সময় স্বাভাবিক থাকে। জন্মের ৩ মাস পর শিশুর গুরুতর হৃদরোগ ধরা পড়তে পারে।

প্রথম সন্তানের জন্মগত হৃদরোগ হলে দ্বিতীয় সন্তানের জন্য কখন পরিকল্পনা করা উচিত, আর দ্বিতীয় শিশুরও জন্মগত হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

সভাপতি বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি এবং সভাপতি পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সোসাইটি অব বাংলাদেশ অধ্যাপক ডা. মনজুর হোসেন।

স্বাভাবিক পদ্ধতিগত শরীরের রক্তচাপ প্রায় ১০০-১২০ mmHg (সিস্টোলিক) এবং ৬০-৮৯ mmHg (ডায়াস্টোলিক)। ফুসফুসের রক্তচাপ সিস্টেমিক চাপের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে গড় SpO2 হলো ৬০-৬৫% এবং বাম দিকে SpO2 হল >৯৫%। সাধারণত, বাম হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবেশের একটি মাত্র পথ থাকে, তা হলো পালমোনারি সঞ্চালনের মাধ্যমে।

মায়ের গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ফুসফুস অ্যামনিওটিক তরলের মধ্যে একটি ভাসমান বেলুনের মতো থাকে, তাই বিকল্প চ্যানেলগুলো, অর্থাৎ পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস পাওয়া যায়। এ চ্যানেলগুলো জন্মের পরে এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। যদি বন্ধ না হয়, তাহলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে কিছু জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলো খোলা থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দেওয়া হয়।

জন্মগত হৃদরোগের লক্ষণ

বিভিন্ন উপসর্গ দেখে শিশুর মধ্যে হৃদরোগ শনাক্ত করা যায়। তবে, বয়স অনুসার লক্ষণগুলো পরিবর্তিত হয়। কিছু কিছু উপসর্গ থাকলে শিশুর হৃদরোগ আছে তা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়। জন্মগত হলেও জন্মের পর বা কিছু সময়ের জন্য জন্মগত হৃদরোগের কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। কখনও কখনও সাধারণ জন্মগত হৃদরোগ, যেমন ‘হোল-ইন-হার্ট’ জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে শনাক্ত করা যায় না। সবচেয়ে সাধারণ হৃদরোগ যেমন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস প্রথম ১-৪ সপ্তাহে লক্ষণহীন থাকতে পারে। এটি ফুসফুসের চাপ এবং রক্তপ্রবাহ পরিপক্কতায় বিলম্বের কারণে ঘটে থাকে। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ত্রুটি এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস (ভিএসডি এবং পিডিএ) ধীরে ধীরে ফুসফুসের চাপ ও রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং হার্টের আকারও বাড়ায়।

হৃৎপিণ্ডে একটি বড় ছিদ্র হলে ফুসফুস এবং শরীরের মধ্যে রক্ত প্রবাহের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। হৃৎপিণ্ডে একটি বড় ছিদ্র বর্ধিত শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রচেষ্টার জন্য হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শরীরের বৃদ্ধি ধীর হয়, দুর্বল বা ওজন বৃদ্ধি পায় না।

জন্মের ৪-৬ সপ্তাহ পরে লক্ষণগুলো শুরু হয়।

অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট হলো আরেক ধরনের ছিদ্র, যা অনেক বছর ধরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সুপ্ত থাকতে পারে। স্টেনোসিস বা ভালভের সংকীর্ণতা যে কোনো বয়সে এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত।

যারা হৃদরোগের জন্য কিছু সূত্র খুঁজে বের করতে ক্লিনিকাল পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ কিছু পরীক্ষা যেমন বুকের এক্স-রে, ইকো এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফি উপর ভিত্তি করে CHD-এর উপস্থিতি সনাক্ত করতে পারে। নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা গেলে অবশ্যই জন্মগত হৃদরোগের ব্যপারে শিশু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

* দুধ খাওয়ার সমস্যা: শিশু যদি কিছু সময় দুধ চুষেই হাপিয়ে যায় এবং দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তারপর আবার চুষতে শুরু করে অথবা দুধ খেতে বেশি সময় নেয় (>২০ মিনিট), কিংবা খাওয়ার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায় এবং ঘাম হয়।

* ওজন বৃদ্ধি সন্তোষজনক না হলে: শিশুর ওজন বৃদ্ধির হার বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ না হলে।

* ঘনঘন ঠান্ডা লাগা বা কাশি হওয়া: শিশুর বারবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাহলে আংশকা থাকে তার হার্টের ত্রুটি আছে।

* জ্বর বা কাশি ছাড়া, ক্রমাগত দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস (এমনকি ঘুমের সময়) এবং বুকের পাজর বা খাঁচা দেবে যাওয়া।

* শিশুর হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত চলে (এমনকি ঘুমের সময়ও)। মা-ই এ বিষয়টি সহজে ধরতে পারবেন।

lPrecordial bulge: বুক একপাশে ফুলে যাওয়া। কোন কোন শিশু সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত শ্বাস নিতে শুরু করে।

* নীল শিশু (Cyanotic Heart Disease) : শিশুর ঠোঁট, জিহ্বা এবং নখ নীলাভ হবে বা কান্নার সময় নীল হয়ে যায়। জন্মগত হৃদরোগের কারণে ত্বক, নখ, জিহ্বা এবং ঠোঁটের রঙ পরিবর্তন হতে পারে। এটি ঘটে যখন ভালো বা অক্সিজেন সমৃদ্ধ লাল রক্ত অক্সিজেন ক্ষয়প্রাপ্ত নীল রক্তের সাথে মিশে যায় এবং শরীরে সঞ্চালিত হয় যা ত্বক, নখ, জিহ্বা এবং ঠোঁটে সর্বদা বা কমপক্ষে যখন সে কাঁদে তখন স্পষ্ট

হয়। এটি একটি গুরুতর জন্মগত হৃদরোগ, যার জন্য প্রাথমিকভাবে ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়। উপরের কয়েকটি লক্ষণ বা সমস্যা পরিলক্ষিত হলে ডাক্তারের পরামর্শে জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহে হার্ট সার্জারি করাতে হবে।

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুর যত্ন

কিছু কিছু CHD-এর প্রাথমিক বা জরুরী হস্তক্ষেপ ও চিকিৎসা প্রয়োজন হয়, অন্যথায় শিশুর বেঁচে থাকা ঝুঁকিতে পড়ে বা অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। CHD-এর লক্ষণ ও টাইপের উপর নির্ভর করে কিছু CHD নিয়মিত ফলো-আপের প্রয়োজন হয় এবং প্রথম দিকে প্রতি কয়েক সপ্তাহ পর পর প্রয়োজনীয় ফলো-আপ প্রয়োজন হতে পারে।

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, তবে কিছু কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাই মাতা-পিতাই সঠিক ভাবে যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি সময় মতো CHD নির্ণয় করা হয় এবং চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় তবে বেশিরভাগ CHD নিরাময়যোগ্য। অনেক শিশুর ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি এবং কিছু ক্ষেত্রে দেরিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, CHD-এর বেশিরভাগই সাধারণ ত্রুটি এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু ওষুধেই নিরাময়যোগ্য।

যেসব শিশু সময়মতো চিকিৎসা পায়, তারা তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী জীবন ধারন করতে পারে। অন্যদিকে, CHD আক্রান্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না এবং তাদের একটি সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জীবনধারা পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাদের একাধিক পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। নীল শিশুরা ডিহাইড্রেশন এবং রক্তস্বল্পতা সহ্য করতে পারে না, তাই এই নীল শিশুরা কান্না করলে তাদের সমস্যা গুরুতর হয়ে যায়, যাকে স্পেল বলা হয়। যখন তারা দ্রুত শ্বাস নেয় ও আরও নীল হয়ে যায় এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এই শিশুদের ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

CHD আক্রান্ত হলে সময়মতো চিকিৎসা সর্বোত্তম ফলাফল নিয়ে আসে। প্রথম সন্তান যদি CHD-তে আক্রান্ত হলে সেই মা যদি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হন তাহলে অনাগত শিশুদের মধ্যে ২-৫% এর CHD-তে আক্রান্ত ঝুঁকি থাকে। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় প্রসূতি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চলা উচিৎ। ১৬ থেকে ১৯ সপ্তাহের মধ্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে

গর্ভের শিশুর CHD ধরা পড়লে গর্ভপাতের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেনেটিক কাউন্সেলিংয়েরও সুপারিশ করা হয়।

শিশুদেরও কি ডায়াবেটিস হয়?

ডায়াবেটিস সর্বগ্রাসী রোগ। এ রোগ একবার কারো হলে শরীরে নানা জটিলতা বাড়তে থাকে। মধ্যবয়সে সাধারণত ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। তবে বর্তমানে তরুণ বয়সেও অনেকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। শিশুদেরও ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি আছে কিনা এমন প্রশ্ন জনে জনে।

মূলত মানসিক দুশ্চিন্তা, ওজন বেড়ে যাওয়া, কায়িক শ্রমের ঘাটতি, বংশীয় কারণ, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন এসব কারণে ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ধরা পড়ার আগেই সতর্ক থাকতে হয়।

শিশুদের ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সোসাইটি অব বাংলাদেশের অধ্যাপক ডা. মনজুর হোসেন।

শিশুদের মধ্যেও ডায়াবেটিসের প্রকোপ বাড়ছে। বেশিরভাগ শিশু শৈশবে টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। তবে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। আগে চিকিৎসকরা জানতেন যে বাচ্চারা কেবল টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং একে দীর্ঘকাল ধরে কিশোর ডায়াবেটিস (Juvenile Diabetes) নামে নামকরণ করা হতো। শিশুদের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের একক প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত ওজন। যখন কোনো শিশুর ওজন খুব বেশি বেড়ে যায়, তখন তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশংকা দ্বিগুণ হয়।

শিশুদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস অবস্থায় শরীরে ইনসুলিন উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য ইনসুলিনের দরকার পড়ে। ইনসুলিনের ঘাটতি বা অভাবকে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন বা পাম্পের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কারণ ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো ধ্বংসের কারণে এমনটি হয়। কেন এমনটি ঘটে তা সঠিকভাবে কেউ জানেন না, তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটা জিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। টাইপ-১ ডায়াবেটিস সম্ভবত ভাইরাসের

সংক্রমণের কারণেও হয়ে থাকে। অন্যদিকে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসে, অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন তৈরিতে কোনো ব্যাঘাত হয় না। তবে শরীর এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সাড়া দেয় না বা প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হয়। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স্ (Insulin Resistance)-এর কারণে এ সমস্যা দেখা দেয় যখন গ্লুকোজ কোষগুলোতে প্রবেশ করতে পারে না এবং শক্তি সরবরাহ করার সক্ষমতা কমে যায়। এ কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে পর্যায়ক্রমে অগ্ন্যাশয় আরও বেশি বেশি ইনসুলিন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। অবশেষে, এক সময় অগ্ন্যাশয় রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন করতে ধীরে ধীরে অক্ষম হয়ে পরে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য বাচ্চাদের ঝুঁকির তিনটি কারণ-

* পরিবারের একজন সদস্যের টাইপ ২ ডায়াবেটিস থাকলে।

* মায়ের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসসহ (গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস) জন্ম নেওয়া শিশুদের।

* যদি সন্তানের ওজন বেশি হয় এবং ওপরের দুটি ঝুঁকির কারণ থাকে।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ: রক্তে উচ্চমাত্রার শর্করার জন্য ঘনঘন প্রস্রাব হয় এবং খুব তৃষ্ণার্ত থাকে বিধায় প্রচুর পানি পান করতে হয়। ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ থাকে। কারণ শরীর শক্তির জন্য গ্লুকোজ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশু এবং কিশোরদের ক্ষুধা বাড়তে পারে তবে ক্ষুধার্ত কোষগুলোকে জ্বালানি সরবরাহ করার প্রয়াসে শরীর পেশি ভেঙে ফ্যাট সংরক্ষণ করে যার জন্য ওজন হ্রাস পায়।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা: শিশুর টাইপ-১ বা টাইপ-২ ডায়াবেটিস আছে কিনা তা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা টাইপের ভিত্তিতে পৃথক হয়। মেটফরমিন নামে একটি ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এটি এবং ইনসুলিন হলো ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সি শিশুদের জন্য রক্তে শর্করার হ্রাসকারী দুটি ওষুধ মাত্র।

চিকিৎসা অর্থাৎ লক্ষণগুলো হ্রাস করার জন্য ভালো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ এবং শিশু যাতে স্বাভাবিকভাবে তার শারীরিক, মানসিক, সংবেদনশীলতা বজায় রেখে সামাজিক বৃদ্ধি এবং বিকাশে সম্ভব হয়। আর এর জন্য, বাবা-মাকে লক্ষ রাখতে হবে শিশুর রক্তের শর্করার মাত্রা যতটা সম্ভব লক্ষ্য সীমার

মধ্যে রাখা।

ডায়াবেটিসের কোনো নিরাময় নেই, ডায়াবেটিসের জন্য আজীবন চিকিৎসা প্রয়োজন। টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশু-কিশোররা তাদের রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিদিন ইনসুলিন ইনজেকশন বা ইনসুলিন পাম্পের ওপর নির্ভর করে। শিশুদের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে লক্ষণ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং প্রথম দিকে কোনো লক্ষণই থাকে না। কখনো নিয়মিত চেক-আপের সময় এই ব্যাধিটি শনাক্ত করা হয়।

ডায়াবেটিস থেকে জটিলতা

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে ভবিষ্যতে হৃদরোগ, অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে এবং কিডনি অকার্যকর হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে মৃত্যুঝুঁকিও বেড়ে যায়। এছাড়া ডায়াবেটিসে পরবর্তী জীবনে সরু রক্তনালি, উচ্চরক্তচাপ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। স্নায়ু বা নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিরোধ

তরুণদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের সমস্যা বাড়ছে। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে এ ভয়াবহ অবস্থার প্রতিরোধ সম্ভব। স্থূলতা বা যাদের ওজন বেশি-বিশেষ করে যদি তাদের পেটের চর্বি বেশি থাকে-তাদের ইনসুলিন অকার্যকর বা প্রতিরোধ (Insulin Resistance) হওয়ার আশংকা বেশি থাকে, তাই টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন প্রতিরোধ একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না, যদিও কিছু বাচ্চার ত্বকে ঘন, গাঢ়, কাল মখমল প্যাঁচ তৈরি হয় যাকে অ্যাক্যানথোসিস নিগ্রিকানস (Acanthosis Nigracans) বলা হয়, সাধারণত ঘাড়ের পেছনে বা বগলের মতো শরীরের ক্রিজ এবং ভাঁজগুলোতে।

সুস্থ দাঁতের জন্য মেনে চলুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

আমাদের দেশ বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিন দিন উন্নত হচ্ছে। দন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক আধুনিক হয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় এসেছে অগ্রগতি। কিন্তু সারা বাংলাদেশের অধিকাংশ বিভাগের গ্রাম পর্যায়ের মানুষ এখনো জানেন না কিভাবে দাঁত মাজতে হয়? কী দিয়ে, কয়বার মাজতে হয়?

চিকিৎসা ব্যবস্থা যতই আধুনিক হোক না কেন, যে দেশের মানুষ ঠিক মতো দাঁত ব্রাশ করতে জানে না,তাদের মুখ ও দন্ত স্বাস্হ্য ব্যবস্থায় কোনো অবস্থাতেই উন্নতি সম্ভব নয়।

সিলেট বিভাগে শহর এবং গ্রামের স্কুলের বাচ্চাদের দাঁত ও মাড়ির অসামঞ্জস্যতা নিয়ে আমি গবেষণা করেছি। সেখানে অধিকাংশ বাচ্চাদের, শহর এবং গ্রামের উভয় স্থানেই এ সমস্যা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শহরের বাচ্চাদের গ্রামের তুলনায় কিছুটা বেশি দাঁত উচু,নিচু,আঁকা বাঁকা।আর মেয়ে বাচ্চাদের দাঁতে বেশি সমস্যা।

সেখানে গবেষণা করতে গিয়ে তাদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি ,তারা ঠিক মতো দাঁত ব্রাশ করতে জানে না, শক্ত খাবার চিবিয়ে খেতে চায় না,দাঁতে ক্ষয় হলে ডাক্তারের কাছে যায় না, বিশেষ করে মেয়ে বাচ্চাদের ধর্মীয় গোড়ামির কারণে ডাক্তার দেখাতে চায় না, বেশি বেশি ফাস্টফুড খায়। সবশেষে বিভিন্ন বিডিএস ডাক্তার নয় এমন লোকদের কাছে ভুল চিকিৎসা নিয়ে অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছে।

ছোটবেলা থেকে যদি দুধ দাঁতের যত্ন না নেয়া হয়,ভবিষ্যতে দাঁত উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা ছাড়াও মাড়ির নানা রকম সমস্যা নিয়ে, এই শিশুরা বড় হয়ে উঠবে।আমাদের এখনই উচিত শিশুদের দাঁতের যত্নে পথ শিশু থেকে শুরু করে, স্কুল, মাদ্রাসা, এতিমখানা সব জায়গায় সচেতনতার পাশাপাশি দাঁত ব্রাশের টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে পৌঁছে দেয়া।

শিশুদের দাঁতের যত্ন মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করতে হয়। গর্ভাবস্থায় মা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকলে বাচ্চার ঠোঁট ও তালু কাটা হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। নোংরা পরিবেশের ফলে মায়ের শরীরে বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ হয় যার ফলে বাচ্চার ঠোঁট ও তালু কাটা হয়

বা হওয়ার আশংকা বেশি থাকে।

গর্ভবতী মায়ের বয়স বেশি হলে, ডায়াবেটিস, মাত্রাতিরিক্ত মেডিসিন নিলে বা হেভিডোজের ড্রাগ মাদকাসক্ত হলে, গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবারের অভাব হলে শিশুর ঠোঁট ও তালু কাটা হতে পারে। কিছু ওষুধ আছে যা খেলে বাচ্চার দাঁত হলুদ হতে পারে। তাই মাকে এবং শিশুর অভিভাবককে অবশ্যই শিশুর দাঁতের যত্ন সম্পর্কে সচেতন এবং জ্ঞানী হতে হবে।

এখনই সময় এই শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের দাঁতের যত্নে ভীষণভাবে সচেতন হওয়া। দাঁতের আঁকা বাঁকা,উঁচু নিচু চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল।

সারা বাংলাদেশের মানুষকে এই ব্যপারে সচেতন করতে হবে। অন্যথায় চিকিৎসার অভাবে বড় হয়ে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হবে আজকের এই শিশুরা। আজকের শিশুরা আগামীদিনের ভবিষ্যত। শিশুদের এবং অভিভাবকদের মাঝে দন্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে,এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ভীষণ ভাবে ঝুঁকিতে পড়বে।

যেসব লক্ষণে বুঝবেন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার একটি জটিল রোগে। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানা কারণে এই ক্যান্সার হয়।এপেনডিক্স, পায়ুপথ ও বৃহদান্ত্রের ক্যানসারকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি ও উপসর্গ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক।

বয়স : কোলোরেক্টাল ক্যান্সার যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে এ রোগে আক্রান্ত প্রতি ১০ জনের ৫০ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সে এ রোগ হতে পারে। লিঙ্গ: পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

ধূমপান ও অ্যালকোহলের ব্যবহার : ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীদের চেয়ে ৩০-৪০ ভাগ বেশি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। অ্যালকোহল ব্যবহারকারীদের মধ্যেও এ রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

অন্ত্রের অন্যান্য অসুখ: আগে থেকেই অন্ত্রের অন্য কোনো অংশে থাকা ক্যান্সার বা পলিপ অথবা অন্ত্রের অন্যান্য রোগ, যেমন মলাশয়ে আলসার তৈরি করে এমন প্রদাহ, অন্ত্রের প্রদাহ এ রকম কিছু কারণে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বংশগত: বংশগত কারণেও কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। মা-বাবা, ভাইবোনের কারোর ৬০ বছর বয়সের নিচে অন্ত্রের পলিপ বা ক্যান্সার থাকলে অথবা যে কোনো বয়সে যে কোনো দুজনের এ ধরনের সমস্যা থাকলে আপনি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

লক্ষণ: মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন। ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা পর্যায়ক্রমে ডায়রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য। মলের সঙ্গে রক্ত মিশে থাকে। ওজন কমে যায়। দুর্বলতা। পেটে অস্বস্তিভাব যেমন- গ্যাস, পেট ফুলে থাকা, পেট ভর্তি ভাব, কামড়ানো প্রভৃতি। রক্তশূন্যতা। রোগের শেষপর্যায়ে মলত্যাগ করতে না-পারা বা অন্ত্রনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া।